তারিখ 07 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সংবাদ

# অভিভাবকদের অবিমৃষ্যকারিতা এবং সভ্যতার পতন

সৈয়দ মনির হেলাল

'স্কুলে মোবাইল ফোন নিষেধ করায় ছাত্র ও অভিভাবক মিলে পেটাল শিক্ষকদের : আহত ১১ শিক্ষক-শিক্ষিকা।' (দৈনিক সংবাদ : ১৭ আগস্ট ২০১৬)

খুব সাধু ভাষা বড়ো বেমানান এখানে। লজ্জা নিবারণের জন্য মুখ লুকোনো লজ্জাকে আরো বে-আব্রু করে তোলারই নামান্তর! তাই বলি, এহেন আচরণকে ষণ্ডামি ছাড়া বলা যায় না আর কিছুই !

সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ঘুম হারাম করা 'নমস্য অভিভাবকবৃন্দ' প্রকৃতই আজ ষণ্ডা-গুণ্ডার কাতারে নামিয়ে এনেছেন নিজেদেরকে। তা নাহলে এই অভিভাবকরা কী করে শিক্ষকদের গায়ে হাত তুলতে পারেন এভাবে? শিক্ষকদের 'অমার্জনীয় অপরাধ' স্কুলে মোবাইল ফোন আনতে ছাত্রদের বারণ করেছেন তারা। কতো বড় স্পর্ধা! আমার দেয়া মাইনের টাকায় যার কিনা দুবেলা অন্ন জোটে মুখে– সেই আমার আদরের দুলালকে তার যদৃচ্ছা স্বাধীনতা ভোগে বাদ সাধে! অতএব মারো বেটাকে। সাধু সাধু! গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার উলপুর পিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের হে মহামহিম অভিভাবকবৃন্দ, আখের ফকফকা আপনাদের জন্য!

ঘটনা কেবল এই একটিই নয়। প্রায় প্রতিদিন সকাল-বিকাল হরহামেশা ঘটেই চলেছে এমন ঘটনা। আর খবরের কাগজগুলো বেহায়ার মতো তারস্বরে চিৎকার করে যাচ্ছে আমাদের কানের কাছে।

–বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি নির্বাচনে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হেরে যাওয়ায় মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার হায়দরগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে মারধর : ৮ আগস্ট ২০১৬।

–বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহের গৌরিপুরের সিধলা ইউনিয়নের হাসনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে মারধর করে তালাবদ্ধ করে রাখেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা : ২৮ জুলাই ২০১৬।

–লালমনিরহাট কালীগঞ্জের খাস্তরচড়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের স্কুল কমিটির সদস্যপদ থেকে বাদ পড়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে স্থানীয় এক প্রভাবশালী মারধর করেছেন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষককে: ৩ জুন ২০১৬।

মাত্র ক'দিনের ঘটনা এগুলো। আরও আছে– এবং ঘটেই চলেছে একটার পর একটা। ছড়িয়ে পড়ছে ভাইরাসের মতো। কিন্তু কর্ণকুহরে ঢুকছে না কারো। কুম্ভকর্ণের ঘুমে অচেতন সবাই। কে করবে এর প্রতিকার?

তা ঠিক! প্রতিকার যারা করবেন অভিভাবক রূপটি তাদের আরও দশাশই! কারণ, দেশ এবং দশের কথা ভাবতে ভাবতে তাদের সারা গায়ে নেতা-জননেতার লেবেল আঁটা যে! অতএব, এই তাদের থেকে বড়ো অভিভাবক আর কে আছে মুল্লুকে! আজ তাদের হাতেই পয়দা হয় ভালো-মন্দ-ন্যায়-অন্যায়- মায় হালাল-হারাম পর্যন্ত। তা-ই চলছে– লীলায়-অবলীলায়! এবং এই অভিভাবকগণ বাৎসল্যপ্রেমে মজে গিয়ে শিক্ষকদের গায়ে হাত তুলতে তাই কসুর করেন না একটুও। এরা রাজনীতির অভিভাবক, আইনের অভিভাবক– রাষ্ট্রেরও অভিভাবক। বটে! রাষ্ট্রের অভিভাবক আমাদের পালন করেন- রক্ষা করেন। তাদের ছায়াতলেই আশ্রয় খুঁজে শ্রান্ত-ক্লান্তজন। জনতাকে বুকের উষ্ণতায় আগলে রাখবে– সে তো রাষ্ট্রের অভিভাবকই। শিষ্টরক্ষণই তো তাদের ধ্যান-জ্ঞান। অথচ রাজধানীর মান্যি-গুণ্যি সাংসদের চড়-থাপ্পড় গিয়ে পড়ে শ্যামপুরের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পিঠ বরাবর। ভয়-তরাসে বাথরুমে গিয়ে ইজ্জত বাঁচাতে হয় শিক্ষয়িত্রী বেচারিকে। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরাও পিছিয়ে নেই এক্ষেত্রে। শিক্ষা কিংবা শাসনযন্ত্রের অভিভাবকত্ব ফলাতে গিয়ে তাই শিক্ষককে উপুড় হতে হয় ক্যাডার-কর্তার পদযুগলে।

অভিভাবক আছেন আরও নানান আকারের এবং প্রকারের। অফিসের বড়ো কর্তা যতোই হম্বি-তম্বি করুন না কেন প্রকৃত অভিভাবক হওয়া সকলের কাজ নয়। গ্রাম-পঞ্চায়েতের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হলেই সবাই যে তাকে অভিভাবক মান্য করবে তা ঠিক বলা যায় না। অবশ্য দলের অভিভাবকগিরি ফলাতে হলে পয়সার জোরটা দরকার আগে। তবে গাঁয়ে না মানলেও আজকাল সমাজের মোড়লিপনা কিন্তু থেমে নেই একটুও।

আর ওসমান সাম্রাজ্যের সেলিমদের ইলিম কিংবা জারিজুরি তো জানে দেশবাসী সকল।

সেলিম ওসমান যেমন একজন পিতা- যেমন একজন অভিভাবক, তেমনি দেশের একজন নেতা এবং অভিভাবকও বটে। আর তাই তিনি তার অভিভাবকত্ব ফলান আঙুল উঁচিয়ে শিক্ষককে কান ধরে ওঠবস করিয়ে যে শিক্ষায়তনে সন্তানকে পাঠানো হয় মানুষ হওয়ার জন্য, সেই শিক্ষককে না পেটাতে পারলে আজকাল অভিভাবক হওয়া যায় না। এবং সেলিম ওসমান প্রথম নন, শেষও নন। হামেশাই ঘটছে এমন বর্বরতা।

**অথচ কথা ছিল অন্যরকম।**

ভাবনার অন্ত নেই একজন অভিভাবকের। অভিভাবকই তো রক্ষা করবে– পালন করবে। আগলে রাখবে সকল প্রকার দৈবদুর্বিপাক থেকে। প্রখর সূর্য-তাপ-জরা-খরায় ছায়ার শীতল পরশ বুলিয়ে দেবে– সে তো অভিভাবক। সামনের পথ যেন হয় কুসুমশোভিত, এই পথহাতড়ে চলা যাপিত জীবনে অভিভাবকগণ হাত ধরে নিয়ে যাবে দিগন্তপানে– যেন সন্তানটি সভ্য হয়ে ওঠে– মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে তাই তো একজন অভিভাবকের কায়মন প্রার্থনা।

তাই অভিভাবকগণ চেয়ে থাকেন শিক্ষকগণের পানে– সন্তানকে তাদের হাতে সঁপে দিয়ে। শিক্ষকের স্থান যে মাথার উপরে– সারা জীবনের জন্য। কখনোই প্রভু নন তারা- নন দেবতাও। তারা পথ দেখান– সন্ধান দেন আলোর। স্নেহ আর ভালোবাসা দিয়ে অমৃতলোকের সন্ধান কেবল দিতে পারেন শিক্ষকগণই। জীবন-সোপানে তারাই তো চিরবন্ধু-চিরসখা। পূজার অর্ঘ্য কাঙ্ক্ষিত নয় তাদের মোটেই। শিষ্যরা মানুষের ভূষণে সুন্দর হয়ে উঠলেই আনন্দে চোখ ছলছল করে ওঠে তাদের। আনন্দের এ অশ্রু থেকে আর আরাধ্য কিছু নেই তাদের। জনক-জননী-পিতা-মাতা একটি সন্তানের কাছে যদি হন জন্মদাতা কিংবা পালনকর্তা, শিক্ষক সেখানে তার চেয়েও বেশি– তিনি দীক্ষাগুরু– অনুসরণীয় মহাপুরুষ। সদ্য স্কুলগামী একটি শিশুকে জিজ্ঞেস করে দেখুন– সে কি হতে চায়, চোখ-মুখ উজ্জ্বল-আলোকিত করে সে নির্দ্বিধায় বলবে 'শিক্ষক'। জন্মের পর মা ডাকটি যেমন শিখেছে মায়ের থেকে, তেমনি 'অ-আ' অক্ষরটি শিখেছে তার শিক্ষকের হাত ধরে। একজন শিক্ষক– কী অপার বিস্ময় তার কাছে! তাই শিক্ষক যা শেখান তার বাইরে যেতে প্রবল আপত্তি একটি শিশুর। এজন্যে কখনোবা ঝগড়াও হয় মা-বাবার সাথে। কতো কিছু জানেন তার শিক্ষক ! তাই একটি শিশুর প্রথম কল্পনা ডানা মেলে উড়তে চায় একজন শিক্ষককে ঘিরেই। শিক্ষকই তো একটি সন্তানকে বলে দেন, মা-বাবার ত্যাগের কথা- তাদের সম্মানের কথা। শিক্ষক ছাড়া কে আছে আর যিনি এমন করে বলতে পারেন- তুমি বড়ো হও- মানুষ হও! সারা জীবনের যা কিছু সঞ্চয় একজন শিক্ষক কী অকৃতদারভাবে দান করে যান তার শিষ্যদের মাঝে। কোনো কার্পণ্য নেই- কোনো প্রাপ্তির লিপ্সা নেই। কী মমতায় বিলিয়ে দেন কষ্টে আহরণ করা সব ধন সব জ্ঞান-বৈভব। ত্যাগেই আনন্দ তার। একটি সন্তানকে আঙুল ধরে হাঁটতে শেখান তার মা অথবা বাবা। কিন্তু একজন শিক্ষক তাকে শেখান তার বুকটা কিভাবে সটান রাখতে হয়– উঁচু করে রাখতে হয় মাথাটি। শিক্ষকই তাকে প্রথম পাঠ দেন স্থির এবং স্থিতধী হতে। তার মগজটা এমন করে গড়ে তোলেন যেন সে ভূপাতিত না হয় মানবকুল থেকে। একটি শিশু যথার্থ 'মানুষ' হয়ে ওঠে একজন শিক্ষকের ছোঁয়া পেয়েই।

অথচ সে শিক্ষককে লাঠিপেটা করছে অভিভাবক আর শিক্ষার্থীরা মিলে। হে ধরণী তুমি দ্বিধা হও!

আবার সভ্যতার বড়াই করে নিজেকে আমরা জাহির করছি 'অভিভাবক' বলে। আর হামেশাই আচরণ করছি অসভ্য-অভদ্রের মতো। শিক্ষকের উপর হাত তোলার ষণ্ডামি করে দাবি করছি- আমি অভিভাবক। আমার সন্তানকে যার হাতে সঁপে দিয়েছি মানুষরূপে গড়ে দেয়ার জন্য, তাকে তুইতুকারি করে লাঠির ঘা বসিয়ে দিচ্ছি মাথা বরাবর। হায়! এ লজ্জা ঢাকি কেমন করে! কী করে বলি আমি একজন অভিভাবক!

সন্তানের জন্য একজন অভিভাবকের আমৃত্য ভাবনার অন্ত নেই। সন্তানের জনক তো আর কম কথা নয়। জন্মদানকারীই আসলে অভিভাবক। তা তিনি মা হতে পারেন আবার বাবাও হতে পারেন। তবে মা'কে সে অধিকার কদাচিৎ লাভ করতে দেখা যায়। সন্তানের অভিভাবক তাই বাবাই, সচরাচর। শুধু সন্তানই নয়, একটি পরিবারের যিনি কর্তা তিনি সে পরিবারের অভিভাবকও বটে। তিনিই পরিবারটিকে পালন করেন। তবে সন্তানের দেখভাল করা মা'রই কাজ বেশি। তারপরও অভিভাবকত্বের প্রশ্ন এলে সবাই একবাক্যে বাবার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তা হওয়ারই কথা অবশ্য। সংসারের পেছনে যিনি টাকা-পয়সা খরচ করেন তারই তো অভিভাবক হবার জোর দাবি। তা থাক। তাই বলে অভিভাবককে মারমুখী আচরণ করতে হবে? অথচ আমরা তাই দেখছি। তাদের অভব্য আচরণ সভ্যতার তিলকে কলঙ্ক লেপ্টে দিচ্ছে একে একে। যে সন্তানের কল্যাণ কামনায় একজন অভিভাবক দিনকে রাত করছেন, তাকেই দেখছি সন্তানকাঁখে এমন সব অভব্য আচরণ করছেন যাতে মাথাকাটা যাচ্ছে সমাজ-সভ্যতার! সন্তানটিকে কীভাবে– কতো উপরে তুলবেন তার মরণপণ নিয়ে অভিভাবক কেবলই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছেন। সবাইকে পদপিষ্ট করে শুধুই ছুটে চলা তার। কে মুখ থুবড়ে পড়ল তার দিকে ফিরেও তাকানোর ফুরসৎ নেই! মেডিকেলে ভর্তি করাতেই হবে– ঢালো টাকা– আনো প্রশ্নপত্র। কেজিতে ভর্তি করাতেও নাকি আজকাল আকছার টাকা বিলানো হচ্ছে। সন্তান তার গাড়িওয়ালা-বাড়িওয়ালা হবে সে এককটাই জপ-তপ। বাহ বেশ বেশ! অভিভাবক বলে কথা। কিন্তু একটিবারও সেই অভিভাবক ভাবছেন না, যে অনৈতিকতা দিয়ে সন্তানটির জীবন শুরু করছেন, সে সন্তানটির জীবনের শেষ দৃশ্যটি কী হতে পারে? আমরা প্রতিবছর শুনি প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষারও প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেয়া হয়। একজন অভিভাবক ছাড়া তার পেছনে মাল-মসলা ঢালার মানুষটি কে আছে আর? অভিভাবকই যে সেই অপরাধের নাটেরগুরু– তা বুঝতে খুব গোয়েন্দাগিরির প্রয়োজন আছে কি?

আমরা আমাদের সন্তানের সামনে বড়াই করে নিজেদের অনৈতিকতার কথা বলে যাচ্ছি দিনেদুপুরে। অবলীলায় মিথ্যে কথা উগড়ে দিই সন্তানকে সাক্ষী রেখে। প্রতিবেশীর গিবত //করে নিজে ভালোমানুষ সাজার কী প্রাণান্ত চেষ্টা আমাদের। নিজেকে বড়ো করে তুলবার জন্য সন্তানের সামনে স্বজন-বন্ধুর মুণ্ডুপাত করি হাসিমুখে। শিক্ষক-গুরুজনদের সঙ্গে সন্তানের বেআদবির কথা বলে হেসে কুটি কুটি হয়ে গাল-গল্প করি কলিগদের সাথে। গান-নাচ প্রতিযোগিতায় পুরস্কারটি ছিনিয়ে আনবার জন্য সন্তানকে নিয়ে বিচারকদের সঙ্গে ফুসুরফাসুর করি।

কিন্তু তা হবার তো কথা ছিল না ! অসভ্যতা-লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করাই তো রক্ষাকর্তার প্রাণান্ত চেষ্টা থাকবার কথা। ভব্যতাই অভিভাকগণের মূল পরিচয়। সভ্যতার কল্যাণে সন্তানকে সভ্য করে তোলাই তো হওয়া উচিত একজন অভিভাবকের ধ্যান-জ্ঞান। এবং তাই, একজন প্রকৃত অভিভাবক কখনোই শিক্ষাগুরুকে অপমান করতে পারেন না। তার সন্তানকে যে শিক্ষাগুরুর কাছে পাঠিয়েছেন, তাকে অসম্মান করা, অপদস্থ করা সন্তানটিকে পিতৃপরিচয়হীন করে তোলার নামান্তরই একপ্রকার। সন্তানবাৎসল্যে অভিভাবকগণ পালন করেন জনক-জননীর ভূমিকা। সন্তানের ভালো থাকাটাই তাদের চিরদিনের আরাধ্য। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'– এ তো অভিভাবকেরই চিরকালীন আকুতি। কিন্তু কী করছি– কী দেখছি আমরা? সমাজ-সংসার আর রাষ্ট্রের অভিভাবকদের এ আত্মবিধ্বংসী কর্মের ফেরে সভ্যতা যে আজ পতনোন্মুখ!

অভিভাবকদের অবিমৃষ্যকারিতায় সভ্যতার এ পতন কে আজ রোধ করবে?

[লেখক: আইনজীবী, সংস্কৃতিকর্মী]
syedmoniradv@yahoo.com